পারিবারিক শিক্ষা বনাম রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের ইশতেহার

সূচনার প্রেক্ষাপট: মহীরুহ বনাম শেকড়ের রসায়ন

একটি রাষ্ট্র যদি একটি বিশাল মহীরুহ হয়, তবে পরিবার হলো তার প্রাণদায়ী শেকড়। আমরা যখন একটি গাছের ডালপালা শুকিয়ে যেতে দেখি বা ফলকে বিষাক্ত হতে দেখি, তখন বুঝতে হবে সমস্যাটি ওপরের নয়, বরং মাটির গভীরে শেকড়ে পচন ধরেছে। বর্তমান বাংলাদেশে আমরা রাষ্ট্রীয় যে অবক্ষয়, নৈতিক স্খলন কিংবা দুর্নীতির মহোৎসব দেখছি, তা আকাশ থেকে পড়া কোনো পঙ্গপাল নয়; বরং এটি আমাদের পারিবারিক শিক্ষার চরম সংকটের এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একেকটি পরিবারের প্রতিনিধি। যখন পরিবার তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভে ধস নামা অনিবার্য।

অন্দরমহলের দায়বদ্ধতা: নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, একটি শিশুর চরিত্রের ৭০ শতাংশ গঠিত হয় তার জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে—যা সে পরিবার থেকে শেখে। অথচ আধুনিক অন্দরমহলগুলো আজ নৈতিকতার চেয়ে বস্তুগত অর্জনে বেশি মনোযোগী। একটি রাষ্ট্র যখন নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রের পরিবারগুলো ভেতর থেকে ক্ষয়ে গেছে। আমরা যখন বড় বড় দুর্নীতিবাজদের ফাঁসি চাই, তখন আমরা ভুলে যাই যে সেই চোরটি একদিন কোনো না কোনো ঘরে বড় হয়েছে। যে মা-বাবা সন্তানকে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখান, তারাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্বৈরাচার তৈরি করছেন। রাষ্ট্রকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করাতে হলে প্রতিটি ঘরকে হতে হবে এক একটি ‘নীতিবিদ্যার ল্যাবরেটরি’।

চুরির হাতেখড়ি: পেন্সিল থেকে মেগা প্রজেক্ট

দুর্নীতির শেকড় কিন্তু সচিবালয়ে নয়, বরং শুরু হয় ডাইনিং টেবিল থেকে। শৈশবে যখন একটি শিশু অন্য সহপাঠীর পেন্সিল বা টিফিন বক্স চুরি করে বাড়ি ফেরে এবং মা-বাবা তাকে শাসন না করে ‘বুদ্ধিমান’ বা

‘চালাক’ বলে প্রশ্রয় দেন, ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয় রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের প্রথম পাঠ। যে হাত শৈশবে অন্যের হকে ভাগ বসাতে আনন্দ পায়, সেই হাতই বড় হয়ে রাষ্ট্রের হাজার কোটি টাকার মেগা প্রজেক্টের বাজেট গিলে ফেলে। এই চারিত্রিক স্খলনের দায় রাষ্ট্রের চেয়ে পরিবারেরই বেশি। কারণ, পরিবার যদি শৈশবেই ‘সততার আভিজাত্য’ শেখাত, তবে রাষ্ট্রীয় আমলা বা রাজনীতিবিদরা লোভের কাছে মাথা নত করতেন না।

মেকি জিপিএ-৫ বনাম মানবিক বিবেক: সাফল্যের এক ভ্রান্ত ধারণা

আধুনিক পরিবারগুলো আজ একেকটি ‘রেজাল্ট উৎপাদনকারী’ কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের সন্তানদের আমরা একটিই মন্ত্র জপ করি—’তোমাকে জিপিএ-৫ পেতে হবে’। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে আমরা সন্তানদের বই মুখস্থ করাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তাদের শেখাচ্ছি না কীভাবে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতে হয় বা একটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। যখন এই ‘যেকোনো উপায়ে সফল হওয়ার’ ভয়ঙ্কর নেশা নিয়ে একজন শিক্ষার্থী বড় হয় এবং রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বসে, তখন তার কাছে বিবেক বা নীতিবোধ এক কাল্পনিক কৌতুক মাত্র। বর্তমান রাষ্ট্রীয় অরাজকতা আসলে আমাদের এই স্বার্থপর ও প্রতিযোগিতামূলক পারিবারিক শিক্ষারই চূড়ান্ত বিষফল। যে শিক্ষা কেবল ব্যক্তি-স্বার্থ শেখায়, তা কোনোদিন দেশপ্রেমিক নাগরিক উপহার দিতে পারে না।

ডিজিটাল ভ্রূণহত্যা ও অভিভাবকত্বের দায়

আমাদের রাষ্ট্রীয় অবক্ষয় আজ আর শুধু রাজপথ বা সংসদে সীমাবদ্ধ নেই; তা ঢুকে পড়েছে অন্দরমহলের শোবার ঘরেও। আমরা আধুনিকতার নামে শিশুর হাতে স্মার্টফোন তুলে দিচ্ছি, কিন্তু তারা সেখানে কী দেখছে বা কী শিখছে—তা নিয়ে আমরা উদাসীন। যখন মা-বাবা শিশুর পাশে শুয়ে স্ক্রিনে আদিম উল্লাসে মত্ত হন, তখন সেই নিষ্পাপ চোখগুলো অজান্তেই অন্ধকারের ভাষা চিনে নেয়। একেই আমি বলছি ‘ডিজিটাল ভ্রূণহত্যা’—যেখানে শিশুর নৈতিক সম্ভাবনাগুলো বিকাশের আগেই মেরে ফেলা হচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রকে গালি দিই, কিন্তু ঘরের কোণে বিষাক্ত ডিজিটাল ডিভাইসে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ যে আমরা নিজ হাতে জবাই করছি—সেই নগ্ন সত্যটা স্বীকার করার সাহস আমাদের নেই। যে তরুণ সমাজ আজ ডিজিটাল উন্মাদনায় পথহারা, তাদের এই পথভ্রষ্ট হওয়ার পেছনে পরিবারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদাসীনতাই দায়ী।

সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব: অনলাইন আশীর্বাদ বনাম অভিশাপ

অনলাইন বা ইন্টারনেট আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানভাণ্ডার হলেও আমাদের সমাজে এর ব্যবহার হচ্ছে ভিন্নভাবে। টিকটক বা রিলসের নামে যে কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি আর সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার লড়াই চলছে, তা এই প্রজন্মের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। পরিবার যখন তার সন্তানদের এই সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন সেই সমাজজুড়ে এক ধরণের ‘মানসিক পঙ্গুত্ব’ তৈরি হয়। ডাইনিং টেবিলে বসে মা-বাবা যখন অন্যের গিবত গান এবং পরমত সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা মনে করেন, তখন সেই পরিবার থেকে সহনশীল নাগরিক আসার কোনো সুযোগ থাকে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যের চরিত্র হনন করার যে পৈশাচিক আনন্দ আজ তরুণদের মাঝে দেখা যায়, তা আসলে তাদের পারিবারিক শিক্ষারই এক ধরণের নেতিবাচক প্রতিফলন।

রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: যেখানে নিয়মই অনিয়ম

রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচারহীনতা এবং দুর্নীতির যে জয়জয়কার আমরা চারপাশে দেখি, তা একদিনে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রীয় এই অবক্ষয় আসলে লক্ষ লক্ষ পরিবারের ব্যর্থতার এক সামষ্টিক ও বীভৎস রূপ। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কলকব্জা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে সেই চালকদের পারিবারিক বুনন ছিল নড়বড়ে। যখন একজন অভিভাবক তার সন্তানকে শেখান ‘যেকোনো উপায়ে জয়ী হওয়াই বীরত্ব’, তখন সেই সন্তান বড় হয়ে রাষ্ট্রকে লুটপাট করতে দ্বিধা করে না। আদর্শিক নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না; তা তৈরি হয় প্রতিটি ঘরের পড়ার টেবিলে এবং মা-বাবার জীবনাচরণে। পরিবার যখন তার সন্তানদের দেশপ্রেমের চেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবাদ বেশি শেখায়, তখন রাষ্ট্র তার নৈতিক অভিভাবকত্ব হারায়।

বৌদ্ধিক বিপ্লব: সংস্কারের শুরু হোক ঘর থেকে

আমরা প্রায়ই রাজপথে বিপ্লবের কথা বলি, রাষ্ট্র সংস্কারের স্লোগান দিই; কিন্তু আসল বিপ্লবটা হতে হবে আমাদের মনস্তত্ত্বে। এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ হতে হবে প্রতিটি পরিবারের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রীয় সংস্কার কোনো ওপরতলার প্রশাসনিক হুকুম বা আইনি কাঠামো দিয়ে স্থায়ীভাবে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না নাগরিকের চারিত্রিক ভিত্তি মজবুত হয়। নৈতিকতা, সত্যবাদিতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার যে শিক্ষা আমাদের পরিবারগুলো থেকে হারিয়ে গেছে,

তা পুনরুদ্ধার করাই হোক এবারের সংগ্রাম। রাষ্ট্রকে দোষারোপ করার আগে আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং দেখতে হবে আমরা প্রতিটি ঘর থেকে সমাজকে কেমন মানুষ উপহার দিচ্ছি।

উপসংহার: আগামীর দায়বদ্ধতা ও প্রতিরোধের দুর্গ

পারিবারিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অচল। আমরা যদি আগামীর সুন্দর একটি বাংলাদেশ বা একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই, তবে পরিবারকে তার আদি পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে—অর্থাৎ একটি ‘নৈতিক পাঠশালা’ হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের এই করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে পরিবারকেই হতে হবে নৈতিক প্রতিরোধের প্রথম দুর্গ। মনে রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তনের চাবিকাঠি কোনো নেতার হাতে নয়, বরং প্রতিটি সচেতন মা-বাবার হাতে। ঘরের দেয়ালগুলো যদি সততার পাঠ দিতে শুরু করে, তবে রাষ্ট্রের রাজপথগুলো এমনিতেই কলঙ্কমুক্ত হবে।

গাংনীতে সামাজিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থীদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

মেহেরপুরের গাংনীতে অরাজনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক সংগঠণ ‘প্রস্ফুটন’ এর উদ্যোগে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষার্থীদের করনীয় শীর্ষক কর্মশালা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্র্রাক্তন শিক্ষক মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহর সভাপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল হাসান পলাশ, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, প্রষ্ফুটনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ সালমান সাইফ, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল প্রোগ্রামের আহবায়ক সদস্য সাহান উল্লাহ, মাকসুদুল আজম বাঁধন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রস্ফুটন সদস্য মো: মিফতাহুল ইসলাম।

অতিথিরা কুইজ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে দুটি করে গাছ রোপনের জন্য তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ৩০০টির মতো গাছ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, তীব্র তাপ প্রবাহের কারে প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল কর্মশালা শুরু করেছে । এ বছর প্রস্ফুটন প্রায় ৫০০০ এর অধিক গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে বিতরণ করা হবে।
‘প্রস্ফুটন’ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সংঘ। ‘শিক্ষা ও ঐক্যে আনি মুক্তি’ এই স্লোগানে ২০১৩ সাল থেকে কল্যাণমূলক এই সংঘটি সফলতা ও সুনামের সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।